কবিতাবলি

আপন স্বাধীনতা
ভগীরথ ঘোষ

জীবন-সুতো সঙ্গে নিয়ে সুঁচ চলেছে সময়-কাঁথা জুড়ে
দূরে কাছে একলা দেখে জীবনযাপন
সৃজনক্রিয়ার আনন্দে তার জাগে কাঁপন
শিল্পী-কবি লিখছে দেখি ছবির মতো রঙে রেখায় সুরে
সুখে থাকতে ভূতে কিলোয় প্রথম নিষেধ ভুলে
ছাদ পেটাচ্ছে নাইছে রোদে সুর তুলে সুর তুলে
নিয়ম অমোঘ জেনেই দেখো কুটছে বসে চিঁড়ে
গড়ের মধ্যে ঢুকিয়ে সে হাত নাচায় ঘুরে ফিরে
মেনে নিয়েও মানছি তা কই খুঁজে কল্পলতা
স্রষ্টা সেথায় সৃষ্টি করেন আপন স্বাধীনতা

লোকটা
সুমঙ্গল চট্টোপাধ্যায়

শাস্ত্র পড়েনি, জানে না মন্ত্রও
আবার চায়ও না সে কিছু।
শুধু চুপ করে বসে থাকে
ঠাকুরের ছবির সামনে—প্রতি সন্ধ্যায়।
ফুল কিনে যে নিবেদন করবে
এমন অবস্থা তার নেই।
তবু কী আশ্চর্য!
নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় তার পুজো প্রতিদিন।
কোথা থেকে ভেসে আসে ফুলের গন্ধ আর
শঙ্খধ্বনি। লোকটা দেখতে পায়
ঠোঁট দুটি নড়ছে ছবির মানুষটার।
তিনি বলছেন, 'তোদের চৈতন্য হোক'।
মুহূর্তে দেবালয় হয়ে ওঠে
লোকটার ভাঙাচোরা ঘর—
প্রতিদিন, প্রতি সন্ধ্যায়।

তোমার জন্য
রেণুপদ ঘোষ

তোমার জন্য দাঁড়িয়ে আছি, দাঁড়িয়ে আছি
কখন থেকে; রেল-স্টেশনে, বাসস্টপেজে,
লঞ্চঘাটাতে। এক-পা এক-পা এগিয়ে যাব
পা সরে না। শিশুর কান্না, শিশুর হাসি—
গায়ের গন্ধ ভুলিয়ে রাখে; পলাশ-শিমুল
রং ঢেলেছে হাজার হাতে। দেখতে দেখতে
রূপের খেলা লঞ্চঘাটাতে সন্ধে নামে;
বাস-স্টপেজে, রেল-স্টেশনে। আঁধার বাড়ে।

একলা আমি দাঁড়িয়ে আছি দাঁড়িয়ে আছি...
ভুলেই গেছি গন্তব্য; কেন আমার দাঁড়িয়ে থাকা!

কথা ছিল সহজ হব, সহজ জলে কান পাতব
কান পাতব গতির মুখে। কথা ছিল—
মোহিনী আড়াল নিয়েই তোমায় খুঁজে নেব
সহজ চোখে। এখন আমার অশ্রু নিয়ে
সাগর কাঁদে... একলা আমি একলা আমি
দাঁড়িয়ে আছি, দাঁড়িয়ে কেবল অন্ধকারে।

ফুরোতেই চাই
সনৎ মণ্ডল

হে ঠাকুর
আমি তো ফুরোতেই চাই;
কিন্তু তুমি না ফুরিয়ে দিলে
প্রদীপ দাহ্যে জ্বেলে
এ-আঁধার
আঁধারেই পড়ে রয়!

‘পালটে গেল পটখানি’

বীথি মুখোপাধ্যায়

এই সেদিনও সেতু পেরোনোর সময়
গঙ্গার কিনারে এক চিলতে জমি খুঁজছিলাম।
‘‘গাছটির স্নিগ্ধছায়া, নদীটির ধারা... এতটুকু বাসা...’’
—এসব ভাবনাকে নিয়েই এক তীব্র আকাঙ্ক্ষায়
উদ্বেল হত মন।
সেতুটা মেরামতির জন্য আর একটু উঁচু এক সেতু দিয়ে
এবার যাতায়াত,
ছুটন্ত গাড়ি—সুউচ্চ বাড়িগুলির ছাদ ছোঁয়া যায়।
ছাদের কোণে সবুজের উঁকিঝুঁকি,
ফুলের হাসিতে রঙের বাহার;
টানটান মেলে-দেওয়া কাপড় চাদর
গৃহস্থালির টুকরো-টাকরা, খুঁটিনাটি—দৃষ্টি এড়ায় না।

এক সকালে আকাশপানে তাকিয়ে থাকা
পক্বকেশী এক প্রৌঢ়ার আকুল দৃষ্টি
আমার এতদিনের বুনে তোলা স্বপ্নজালকে
যেন এক লহমায় টেনে আনল রোদ-ভাসা সেই ছাদে।
... উঁচুতলায় বাস মানেই কি
সুখে-মোড়া সংসারে ঘনীভূত হওয়া?
ঝুট-ঝামেলা এড়িয়ে কোলাহল থেকে পালিয়ে বাঁচা?
অথবা প্রাপ্তি ও পরিতৃপ্তির সহাবস্থান?

প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তরেখায় দাঁড়িয়ে ওই ছাদেই আমার মানস অবস্থান
এক অন্যপট রচনা করল।
—বহতা নদীর তীর ঘেঁষে মাটি আঁকড়ে থাকা—আর নয়।
তরুলতার মতো জড়িয়ে জড়িয়ে এগিয়ে চলা—আর নয়।
এবার ঊর্ধ্বমুখে তাকাই।
এক-আকাশ আলোয় স্নান করুক সমগ্রটি,
একবুক ঠান্ডা বাতাস মিশে যাক অঙ্গে অঙ্গে,
মর্ত্যমাধুরী আবছা হতে হতে আলগা হোক বাঁধনগুলো,
নক্ষত্রময়ী নিশায় নিবেদিত প্রাণ গেয়ে উঠুক—
‘‘মিলাব নয়ন তব নয়নের সাথে’’।

শরণ

অগ্নি বসু

যেভাবে রাখবে তুমি,
সেভাবেই আমি থাকব।
জলকাদায়, ছাইগাদায়, বাবুদের বিছানায়
যেখানে যেমন, যখন যেমন,
ঠিক তেমনই।
আমার আছে শুধু মিউমিউ ডাক,
আর আছ তুমি
ডাক দিলেই যে শুনতে পাও,
জানি তো।
ওই মিউমিউ ডাকটিই শুধু থাক আমার
আর থাকো তুমি।
আমার যে আর কিচ্ছুটি চাই না গো...

সঙ্গী

আলো বসু

কথা দিয়েছ তো! সঙ্গে থাকবে,
ছেড়ে তো যাবে না কোথাও আর
ওদিকে আমাকে বারে বারে ডাকে
দূর পথে কোন দূর পাহাড়।
আলপনা আঁকে চরাচর পটে
কে যেন কে এক পটকার!
তুমি চেনো নাকি! আমি তো চিনি না,
ঘোর লাগে যেন বারবার।
আঁধারের পথে আলো ফেলো আর
মুখটি ঢাকছ আলোর পিছনে,
সেই অবসরে আলো-মাখা পথ
চক্ষু দুটি কী ভীষণ টানে!
কথা দিয়েছ তো! ছলনা কোরো না,
ফেরাও না আলো নিজের দিকে!
অনুষঙ্গের লোভে রেখো না গো,
চিনে নিতে দাও সঙ্গটিকে।

বেলুড় মঠের বাঘা

রূপক চট্টরাজ

একটা কুকুর, একটা ছাগল,
একটা সারসপাখি—
স্বামীজীর তিন ভক্ত এরা
তোমরা জান তা কি?

ছাগলের নাম মটরু ছিল
কুকুরের নাম বাঘা
সারসপাখির নাম জানি না
হয়নি হয়তো রাখা!

ঠান্ডা লেগে সেই পাখিটা
সর্দিজ্বরে ভোগে
স্বামীজীর কী মনটা খারাপ,
বদ্যি ডাকেন রোগের।

নিয়ম করে ওষুধপত্র
খাইয়ে রাশি রাশি
সুস্থ হতেই স্বামীজীর তো
ফুটল মুখে হাসি।

এমন কাণ্ড ঘটেছিল
মটরুভায়ার বেলায়
গরমে সে এতই কাহিল,
প্রাণ বুঝি যায় হেলায়!

স্বামীজী ফের বদ্যি ডাকেন
সুস্থ করতে তাকে—
ঠান্ডা খাইয়ে ঠান্ডা ঘরে
রাজার মতো রাখেন।

একবার মাঝরাত্রে স্বামীজী
ঘর থেকে বেরোতেই
কার গায়ে যেন পা ফেললেন
নিজের অজান্তেই।

বাঘা তখন জানান দিতে
কুঁইকুঁই করে ডাকে
স্বামীজী বোঝেন, নির্ঘাৎ ও
নালিশ করছে তাঁকে।

পরদিন তাই সবাইকে ডেকে
বলেন, এটা ঠিক নয়—
বাঘা আমায় নালিশ জানায়
কেউ মেরেছ নিশ্চয়!

ভগবান আছেন ওর মধ্যে
তোমরা জান না কেউ?
সব্বাই চুপ, বাঘা খুশি খুব,
করে ওঠে ঘেউঘেউ।

বাঘা যখন মারা গেল
ভাসানো হল ভেলায়,
কিন্তু দেহ ফিরে এল
ভাটার লীলাখেলায়।

ফের ভাসানো হল ওকে
জোয়ার এলে শেষে
কী আশ্চর্য, এবারও দেহ
ভেড়ে ঘাটে এসে।

থাকবে না সে প্রভুকে ছেড়ে
সাধের সারমেয়,
তাজ্জব তাই, রাখবে কোথায়
বাঘার মৃতদেহ।

চন্দনগাছের একটি পাশে
গর্ত খুঁড়ে শেষে
বেলুড় মঠের বাঘা শুয়ে—
যায় না নিরুদ্দেশে।